"মিলন পূজা"

শ্রীচিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী (কলাবিভাগ)

(১)

কবি গাহিয়াছেন :—

"বিশ্ব ভরিয়া মিলনের সাড়া,
মিলনের তরে জগৎ খান।
তাইতো তটিনী কুলু কুলু রবে,
টানিছে সাগরে আপন প্রাণ।"

বাস্তবিক এই বিরাট বিশ্বের যে দিকেই তাকান যায় সেই দিকেই দেখা যায় মিলনের একটা অব্যক্ত নীরব ভাব। প্রকৃতি যেন অহরহঃ এই মিলনের গীতি গাহিয়া গাহিয়া পৃথিবীবক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে। তাই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই স্ব স্ব বয়সোচিত মিলনের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু আমার মিলন সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের, আমি যেন একটা লক্ষ্মীছাড়া এবং সৃষ্টিছাড়া জীব।

আমি পল্লীগ্রামস্থ কোন স্কুলে পড়িতাম। যখন আমি ফাষ্ট ক্লাশে পড়ি তখনই আমার যৌবনের সমুদয় লক্ষণ আমার মধ্যে বিকশিত হইতে লাগিল। বলিতে লজ্জা কি—ছেলে বড় হইয়া উঠিলেই আমাদের দেশের মায়েদের মাথায় যেন টনক পড়ে। আমার মায়েরও তাহাই ঘটিল এবং অনতিবিলম্বেই মানব জীবনের চির পুরাতন অথচ চির নূতন ঘটনাটি আমার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল।

পল্লীগ্রামস্থ কোন এক সঙ্গতিশালী ব্রাহ্মণ আমার নিকট তাঁহার কন্যাকে সুপাত্রস্থ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যখন শুনিলাম আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির, তখন যুগপৎ ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম, বৌদিদি এবং অন্যান্য উপহাসকারীদের নিকট আমার আপত্তি জানাইলাম। কিন্তু তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন যে পাকা দেখাশুনা হইয়া গিয়াছে আর কোন কথা বলিবার সময় নাই। বংশমর্য্যাদা বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে—ইহা শুনিয়া আমি বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইলাম। এই সংবাদ যখন আমার বন্ধু-মহলে ছড়াইয়া পড়িল তখন আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কেবল অন্তর্যামী জানেন। বৌদিকে হাত জোড় করিয়া পুনরায় বলিলাম—বৌদি তোমার পায়ে পড়ি তোমরা এসব বন্ধ কর, তিনি বলিলেন—"রেখে দাও ভাই, আর নেকামি কর্ত্তে হবে নাক আমরা ওসব বুঝি।" আমি আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া মাঠে ফুটবল খেলিতে চলিয়া গেলাম।

(২)

কয়েকদিন পরে বিবাহ হইয়া গেল। শুনিলাম মেয়ের নাম "গায়ত্রী সুন্দরী।" মেয়েদের নামের বেলায় আমি সব সময়েই রবিবাবুর মতাবলম্বী। কাজেই নামটাই প্রথমে আমার মনে কি একটা বিরক্তির ভাব জাগাইয়া দিল। পাড়াগাঁয়ে বন্ধুর দল আমাকে রাস্তা, ঘাটে যে সময়েই দেখিত তখনই নানারকম অশ্লীল কথা এবং অসময়ে বিবাহ করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিত। এদের চেয়েও ছিল আর একটী বৃদ্ধ লোক, তিনি আমাকে অতীষ্ঠ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন সবচেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনিন্দুক, কিন্তু সমস্ত কাজেই তাঁহার পরিণামদর্শিতা ছিল অস্বাভাবিক রকমের। একদিন গ্রীষ্মের ছুটীতে ছেলের দল গ্রামস্থ এক জেলেকে পুকুরে

মাছ ধরিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিল; ইতিমধ্যে তিনি যেন কোথা হইতে অকারণ ছুটিয়া আসিয়া গুম্ফমর্দ্দন করিতে করিতে তাহারই কোন এক জন সমবয়স্ক লোককে বলিলেন "দেখ আজকালকার ছেলেদের কোনই পরিণামদর্শিতা নাই। গতরাত্রে যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে পুষ্করিণীর জল কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাতে মৎস্য ধরা চলে কিনা সেটা সম্যক্ বিবেচনা না করিয়াই একটা জেলেকে ডাকিয়া আনিয়াছে।" যাহার নিকট এই কথা বলিতেছিলেন তিনি ছিলেন একজন তরুণের বন্ধু, কাজেই তাহার নিকট এই প্রস্তাব ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন "ছেলেরা চায় একদিন মৎস্য ধরিতে—ধরুক্ না" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যেন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং গলার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া নির্ম্মল গুম্ফটীকে অযথা মর্দ্দন করিতে করিতে—"তুমিও দেখ্‌চি বুড়োকালে ছোকরাদের দলে ঝুঁকে পড়েছ", তৎপরে তিনি নিজেই একটা কাঠি দিয়া পুকুরের জল মাপিয়া দেখিলেন যে পুষ্করিণীর জল দুই ইঞ্চি বাড়িয়াছে, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এ অবস্থায় মাছধরা অসম্ভব। শুধু বৃথা পরিশ্রম হইবে, তখন তিনি জেলেবেটাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ছেলের দল নিরুৎসাহ হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বৃদ্ধের অলক্ষ্যে তোমার মাথায় বাজ পড়ুক ইত্যাদি আশীর্ব্বচন করিতে করিতে চলিয়া গেল, এই ছিল তার স্বভাব। কাজেই তিনি আমার একটুকু খুঁটিনাটি দোষ পাইলেই বলিয়া উঠিতেন—হাঁরে ওসব আমি আগেই জানতাম, ভদ্রলোকের ছেলে এত অল্প বয়সে বিয়ে কল্লে যা হবার তাই হয়েছে। এ আর আশ্চর্য্য কি?

(৩)

এই সমস্ত কারণে আমার জীবন অতি দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

ভাবিলাম আমাদের একজনের মৃত্যু না হইলে এ গঞ্জনার আর শান্তি হইবে না। মনে মনে বলিলাম ভগবান! তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা—তবে কেন আমাকে এই গঞ্জনার দায় হইতে মুক্তি করিয়া দাও না? এই সমস্ত ব্যাপারে আমারও তাহার উপর একটা অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল, তাহার অশন বসন, হাব, ভাব, সমস্তই যেন আমার নিকট বিষময় বলিয়া মনে হইত, তাই তাহাকে দেখিলেও আমার চক্ষুতে শেল বিঁধিত। আমার এই ঔদাসীন্য এবং অবহেলা সেও ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল। সে যদি কোন সময়ে এক গ্লাস জল দিত তবে আমি জলটুকু খাইয়া গ্লাসটী দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। সে নিতান্ত অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিত তারপর ধীরে ধীরে গ্লাসটীকে কুড়াইয়া লইয়া যাইত। কোন সময়ে আমার নিকটে আসিলে অকারণে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতাম, এরূপ যে কতদিন ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা ছিল না, শুধু ইহাই নয়, আধকন্তু আমি তাহাকে ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, সেই আমার যত অশান্তির কারণ এবং সে থাকিতে আমার কখনও শান্তি হইবে না, আমাদের এই কলহের আর একটা এই বিশেষত্ব ছিল যে আমি ইহা কাহাকেও জানিতে দিই নাই, এমনকি বৌদিকে পর্য্যন্তও না।

এইরূপ অশান্তির মধ্যে আমাদের একটী বৎসর কাটিয়া গেল এবং আমার ম্যাট্রিকিউলেশন পাশের সংবাদ যখন আসিল তখন আমার পিতামাতার আর আনন্দের সীমা ছিল না, আমার কিন্তু কোনরূপ আনন্দের অনুভূতি ছিল না, মা কলেজে পড়ার জন্য বলিলেন; তিনি কলেজে পড়া খুব পছন্দ করেন, কাজেই আমাকে আই-এ, পড়িবার জন্যই অনুমতি দিলেন। আমারও কলেজে পড়িবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, সেইজন্য মায়ের উপদেশ ভাল

বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তার এক বিপদ, আমাদের কোন এক আত্মীয় আসিয়া বাবাকে বলিলেন, আজকাল, আই, এ ; বি-এ, পাশ কলিকাতার রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করিতেছে। কাজেই পড়িয়া বিশেষ ফল নাই, বরং মোক্তারি পড়া খুব ভাল। কারণ দেশে মারামারি, চুরি, ডাকাতি বাড়িবে বই কমিবে না। কাজেই মোক্তারের পয়সার অভাব কোন কালেই হবে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই একজন খ্যাতনামা মোক্তারের নাম উদাহরণ স্বরূপও বলিলেন।

বাবা এই সমস্ত শুনিয়া তাহাতেই বাধ্য হইলেন এবং আমাকে মোক্তারি পড়াইবার জন্য কলিকাতায় পাঠানর বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। আমি এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, কারণ মোক্তারি ব্যবসায়কে আমি চিরদিনই ঘৃণা করিতাম। আমার কলেজে পড়িবার ইচ্ছা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেন কোথায় বিলীন হইয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতায় মোক্তারি পড়িতে আসাই স্থির হইল। আসিবার দিন রাত্রে বৌদিকে বলিলাম—এই আমার শেষ বৌদি, আশীর্ব্বাদ করুণ আর যেন ফিরিয়া ওর মুখ না দেখি, পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলাম সেও ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। আসিবার সময় দেখিলাম তাহার চিবুক বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে।

(৪)

কলিকাতায় আসিয়া পরদিন মোক্তারি কলেজে গেলাম, সেখানে গিয়া দেখি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একখানি চেয়ারে বসিয়া সামনের টেবিলে পা উঠাইয়া দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং তাঁহার সম্মুখে চারি পাঁচখানা ক্ষুদ্র বেঞ্চিতে কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র বসিয়া গল্প করিতেছে। ছাত্রদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহাদের মধ্যে

কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সকল রকমেরই আছে, মোটকথা মোক্তারি কলেজের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাকে আর যাহাই হউক, ভক্তি বলা চলে না। আমাকে যিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট নিদ্রিত ভদ্রলোকটীকে ডাকিয়া আমাদের আগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, তারপর তাঁহার সহিত আমাদের অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। পরিচয়ে জানিলাম যে ইনিই নাকি কলেজের সত্বাধিকারী এবং একমাত্র প্রফেসর ও প্রিন্সিপাল। প্রফেসর বলিলেন যে, একশত টাকা অগ্রিম জমা দিলে তিনি পাশ করাইয়া দিবেন—এইরূপ গ্যারাণ্টি দিতে পারেন, এই কথা শুনিয়া আমার মন আরও খারাপ হইয়া গেল এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধেও আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিল। ইতিমধ্যে উক্ত প্রফেসর কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন যে, কোন শিক্ষার্থী কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে মোক্তারি পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এই কথা শুনিবামাত্রই আমার মন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কারণ আমার বয়স্ তখন সার্টিফিকেটে সতর বৎসর ছিল। আমি মনে মনে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মোক্তারি প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিলাম।

(৫)

বাসায় আসিয়া দাদাকে এই কথা বলিলাম। দাদা অগত্যা আমাকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু আমার পড়া মা ব্যতীত, বাটীর অন্য কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই অনেকখানি ইতস্ততার মধ্য দিয়া আমাকে আই-এ, পড়িতে হইল। বাগবাজারের একটা মেস্ বাড়ীতে আমি, দাদা এবং একজন পণ্ডিত একটী রুম ভাড়া করিয়া থাকিতাম, দাদা এবং পণ্ডিত মহাশয় সকালে বিকালে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইতেন। সকাল

এবং সন্ধ্যায় আমি একাই থাকিতাম। একদিন আমি সন্ধ্যায় একা ঘরে বসিয়াছিলাম, রাত্রি তখন ৮টা বাজিয়াছে, এমন সময় বাহিরে সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। দরজা খুলিয়া দেখিলাম একব্যক্তি খাকি পোষাকে আবৃত এবং তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাফটী লইয়া দেখিলাম আমারই নামে, তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে লেখা আছে—"Wife seriously ill come sharp." মনে মনে ভাবিলাম মরুকগে ছাই, মলেই ত বাঁচি। এই টেলিগ্রামের সংবাদ দাদাকে কিংম্বা অন্য কাহাকেও জানাইব না, যাওয়াত দূরের কথা।

কয়েকদিন পরে আবার ঠিক সেই সন্ধ্যা ৮টার সময় পিয়ন আর একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল, তাহা পড়িয়া আমি ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিয়াছিলাম। সে রাত্রে আর পড়া হইল না, যে সংবাদ আমি অহরহঃ কামনা করিয়াছি কিন্তু আজ তাহার যথার্থ আগমনে—কেন জানিনা আমার হৃদয় তন্ত্রীতে অলক্ষে বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিল। সে রাত্রে একথা দাদাকে জানাই নাই। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দাদা বাসায় ফিরিবার পূর্ব্বে শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু পলকের জন্যও ঘুম হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে না। বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। রাত্রিও যেন সেদিন দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইল, সে যেন আর ফুরাইতে চায় না, যেই পাঁচটা বাজিল তখনই উঠিয়া পড়িলাম এবং মুখ হাত ধুইয়া গঙ্গার পাড় ধরিয়া বরাবর নিমতলার দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৬)

সূর্য্যের সোনালি কিরণ তখনও পূর্ব্বাকাশে ছড়াইয়া পড়ে নাই, বিহগকুল যদিও নীড় পরিত্যাগ করিয়াছিল না তথাপি তাহার

কলরব করিয়া বিশ্বমাতার বন্দনা গীতি গাহিতেছিল এবং বিশ্ববাসীকে প্রভাতের আগমনী বার্ত্তা জানাইয়া দিতেছিল! উপরে মেঘাবৃত শ্রাবণের আকাশ গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছিল এবং নিম্নে স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গা আমার বিরহ ব্যথাকে ব্যক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য কুলু কুলু রবে কোন্ সুদূরের পানে ছুটিয়া চলিয়াছিল। নিমতলার শ্মশান-ঘাটে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেখিলাম—উচ্চ, নীচ; ধনী, নির্ধন; ইতর, ভদ্র; প্রভৃতি সকলেই পরস্পরের ভেদাভেদ ভুলিয়া, একইস্থানে চিতা সাজাইয়া হরিনামে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, সেখানে হিংসার স্পর্শ নাই, সমাজের বন্ধন নাই, আভিজাত্যের গৌরব নাই, আছে শুধু অনির্ব্বচনীয় শান্তি। ভাবিলাম "শ্মশানের ন্যায় সাম্যস্থান এ জগতে বাস্তবিকই আর কোথাও নাই"। মনে হইল যত অশান্তির মূল এই দুঃখ দারিদ্রপূর্ণ হিংসা দলাদলি বিক্ষোভিত মানব সমাজ। চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং তাহার চারিদিকে পুত্রশোকবিহ্বলা জননীর হাহাকার, স্বামীহীন রমণীর মর্ম্মবিদারী ভীষণ ক্রন্দন এবং মাতৃহারা শিশুর আর্ত্তনাদ সমস্তই যেন একসঙ্গে মিলিত হইয়া এক গভীর ধ্বনি তুলিয়াছিল এবং ভোরের বাতাস নাচিয়া নাচিয়া সেই ধ্বনি অনন্তের সহিত মিশাইয়া দিতেছিল। পরমুহূর্ত্তে আবার ভাবিলাম এইত মানবের পরিণতি দুই দিনের জন্য কোথা হইতে আসে আবার কোথায় চলিয়া যায়! আমারও ত একদিন ঐরূপ করিয়াই যাইতে হইবে, তবে কেন মিছে যাওয়া আসা, ইহার কারণ কি? ইহার পশ্চাতে কোন মহাশক্তি নিশ্চয়ই আছে এবং তাহাকে লাভ করিলে বোধ হয় আর যাওয়া আসার যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না, এইরূপে নানা চিন্তার পর দেখিলাম প্রায় ৭টা বাজিয়াছে, তখন আবার বাসার দিকে রওনা হইলাম, কিছুদূর আসিয়াই আমার কোন এক পুরাতন

সমপাঠীর সহিত দেখা হইল, সে আমাকে দেখিয়াই বলিল ভাই তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার মুখখানা এত মলিন কেন? আমি বলিলাম কেন? আমার মুখ মলিন হবার ত কোন কারণ নেই? সে বলিল না ভাই! সত্যি বলনা কি হয়েছে তোমার? তখন আমি কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলাম ভাই! বাঁচা গেছে, wife পরশু দিন মারা গেছে, বেঁচেছি এক দায় হতে কি বল ভাই? এই কথা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল দেখ তোমাকে আমার একটী কথা বলিবার আছে, যাকে তুমি চিরজীবনের জন্য সঙ্গী করে নিয়েছিলে, এবং যার সুখ দুঃখ সমস্ত তোমার উপর নির্ভর কর্ত্ত এরূপ একটা জিনিষ পৃথিবী হতে মুছিয়া গেল আর তুমি হাসিতেছ এবং যা তা বকিতেছ? এটা বোধ হয় পুরুষত্বের কিংবা বীরত্বের কাজ নয়। তাহার এই কথা আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যাইয়া আঘাত করিল এবং সেইক্ষণ হতে আমার মন আরও যেন খারাপ হইতে লাগিল, তারপর বাসায় আসিয়া দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে তিনিও তাঁহাকে পূর্ব্বে না জানানর জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তখন হইতে আমার মন যেন ক্রমেই বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। আমার আর কিছুই ভাল লাগিল না।

(৭)

ক্রমে শারদীয়া পূজা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মা আনন্দময়ীর আগমনীর সাড়া সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল। চারিদিকেই আনন্দ! ক্রমে স্কুল, কলেজ, আফিস সমস্ত ছুটী হইতে লাগিল এবং দলে দলে লোক সকল গৃহাভিমুখে গমন করিল, আমিও তাহাদের পথ অনুসরণ করিলাম। তিনদিন বহু আমোদ প্রমোদের পর এই আনন্দ মুখরিত বাংলাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মা কৈলাসে তাঁহার স্বামী-

গৃহে গমন করিলেন, তারপর একদিন বৌদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহার সমস্ত কথা আমাকে বলিলেন। শুনিলাম যে সে নাকি আমার এই তাচ্ছিল্যের জন্য নিজের জীবনকে আর বাঁচিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়াছিল এবং সেইজন্য গোপনে গোপনে অনাহারে থাকিয়া উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি করে ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে নাকি আমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছিল, শুনিয়া আমার হৃদয়ের দুঃখ আরও উথলিয়া উঠিল, সেদিন আর রাত্রে ঘুম হইল না। আমার চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিয়া গেল। সকালে মা বলিলেন "তোর বালিশ ভিজা কেন?" আমি বলিলাম রাত্রে খুব ঘাম হইয়াছিল তাই বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে, মা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, তারপর বাড়ীতে যে আসিত সেই আমাকে আমার হৃদয়হীনতার জন্য গালাগালি করিত, যে বন্ধুর দল আমাকে পূর্ব্বে বড় উপহাস করিয়াছিল, তাহারাও একদিন আমাকে অনেক নিন্দা করিল, সে বৃদ্ধের ত কথাই নাই।

হায় জটিল মানব প্রকৃতি! তুমিই একদিন আমাকে এইরূপ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলে, আজ আবার তুমিই ধিক্কার দিতেছ। আমার এই হৃদয়হীনতার জন্য তোমারাই ত দায়ী। হায়! যে স্বর্ণ লতিকাকে আমি হেলায় হারাইয়াছি তাহাকে বোধ হয় আর এ জীবনে পাইব না। ভগবান! তুমি কত সহ্য কর, কিন্তু আমার এই অপরাধ টুকুই কি তোমার কাছে এত গুরুতর যে তুমি সহিতে পারিলেনা? আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা জানি না, এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু এমন দিন নাই যে, তাহার কথা না ভাবিয়াছি। কিন্তু কই! ভাবিয়াও ত শান্তি পাই নাই, আমার শান্তি বোধ হয় সে লইয়া গিয়াছে, জীবনে আমার শান্তি নাই; তাহাকে ত একদিন স্বপ্নেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, প্রকৃতির

সহিত নাকি মানুষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাই আমি জ্যোৎস্না স্নাত গভীর বাসন্তী রজনীতে একাকী বেড়াইয়াছি তথাপি কই প্রিয়ার দেখাত আমি একদিনও পাই নাই! প্রকৃতিও বোধ হয় আমার প্রতি নির্দ্দয়।

আমার জীবনের সমস্ত সুখ, শান্তি আশা ভরসা অন্তর্হিত হইয়াছে, এ জীবনটা যেন এক বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে, ইহ জীবনে বোধ হয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, যদি পরজন্মে তার দেখা পাই তাহা হইলে করযোড়ে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিব। তাহাতে সে কি আমায় ক্ষমা করিবে না? তাই আমার সমস্ত আশা আকাঙ্খা সেইদিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। আমি :—

"লয়ে তার স্মৃতি
চলি নিতি নিতি
খুঁজি মরণের দেশ কতদূর।"